# কেন এই পত্রিকা

যেমন ঋতুর পর ঋতু আসে, ভোরের পর দুপুর, অক্ষরের পর শব্দ, শব্দের পর বাক্য, ঠিক তেমনই ছাত্রজীবনের পর কর্মজীবন আসা উচিত। প্রস্তুতির পর প্রকাশ। ছাত্রজীবনে আমাদের আত্ম-প্রস্তুতি, কর্মজীবনে আত্মপ্রকাশ।

ছাত্রজীবন শেষ করেও যাঁরা কর্মজীবন শুরু করতে পারেন না, তাঁদের যেমন বুকভরা গভীর দুঃখ ও ক্ষোভ, তেমনি যাঁরা এখনো ওই দুঃখজ্বালার সীমানা থেকে দূরে, এখনো ছাত্র, তাঁদেরও এক ধরনের চিনচিনে নৈরাশ্য থাকে। লেখাপড়া শেষ করে কাজ পাবার অনিশ্চয়তা তাঁদেরও পীড়িত করে।

দেশের এইসব দুঃখজ্বালা, এইসব পীড়া ও নিরাশা অনেকদিন থেকেই আমার মাথায় বাসা বেঁধে ছিল। এই দুঃখ থেকেই একদিন যুগান্তরে লক্ষ লক্ষ কর্মপ্রার্থী ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখতে শুরু করি। আমার ওই এক চিলতে লেখা থেকে কত তরুণ কাজ পেয়েছেন, কতজন যে কতভাবে উপকৃত হয়েছেন, আমার হাজার হাজার মুগ্ধ উপকৃত পাঠক-পাঠিকার চিঠি না পড়লে আমি নিজেও তা জানতে পারতাম না।

চিঠি আসে সারা পূর্ব ভারত থেকে। হাজারে হাজারে। সাধারণত আমি তিন ধরনের চিঠি পাই। এক শ্রেণীর চিঠিতে থাকে কাজ পাবার আনন্দ। এক শ্রেণীর চিঠিতে কাজ পাবার আকুলতা। আর-এক শ্রেণীর চিঠিতে আরো বড় জায়গায় আরো বেশি করে লেখার অনুরোধ।

এইসব প্রেরণা, এইসব অনুরোধেরই যোগফল এই নতুন পত্রিকা— কর্মক্ষেত্র।

যখন ক্লান্তিবশত ভাবছিলাম, যুগান্তরের কলম লেখা থেকে আট-দশ দিনের ছুটি নিয়ে একলা কোনো পাহাড় কি সমুদ্রের কাছে গিয়ে সেখানকার আকাশের সঙ্গে সেখানকার বাতাসের সঙ্গে খুব অন্যরকম কথা বলব, ঠিক তখনই প্রায় দুম করে শুরু করলাম এই পত্রিকা। তবে কি এটাই আমার সেই পাহাড়, সেই সমুদ্র, সেখানকার সেই আকাশ-বাতাস?

*'কর্মক্ষেত্র', ১ আগস্ট, ১৯৮০*

## দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ুক কাজ

আমি চাই 'কর্মক্ষেত্র' থেকে ঝড়ের গতিতে কাজ ছড়িয়ে পড়ুক। ঝড়ের মধ্যে শিমুল তুলোর মতন কাজ ছড়িয়ে পড়ুক দিকদিগন্তে। 'কর্মক্ষেত্র'র পংক্তিতে-পংক্তিতে ফলে উঠুক কাজ শুধু কাজ। চারপাশে শুধু ধৈর্য, শুধু অপেক্ষা, শুধু আশা, শুধু আশ্বাস দেখে দেখে আমি সত্যিই অবাক হয়ে যাই। কিসের অপেক্ষা, কার আশ্বাস? আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আপনার যৌবন, আপনার কাজের ইচ্ছা, আপনার আত্মবিকাশের বাসনা, আপনার অপরিসীম সম্ভাবনা। জীবনের এইসব পরম মূল্যবান ঐশ্বর্য আপনাকে কে দিয়েছে? কোনো কর্তৃপক্ষ? কোনো প্রতিষ্ঠান? কোনো নিয়োগকর্তা? তাহলে? তাহলে কেন তাদের কাছেই আপনি আপনার জীবনের সার্থকতা খুঁজতে যাবেন, চাইতে যাবেন? কেউ আপনার জীবনের মালিক নয়, কেউ আপনার মহিমার মালিক নয়, আপনি নিজে ছাড়া। নিজের কাজের ইচ্ছাকে নিজেই কাজে লাগিয়ে আপনার পরম মূল্যবান যৌবনকেই মর্যাদা দিন মহিমা দিন, সার্থক করুন। আমি চাই কর্মহীনের জীবন এক্ষুনি কাজে ভরে উঠুক, তার যৌবন আনন্দে নেচে উঠুক।

*'কর্মক্ষেত্র', ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০*

## বহুমুখী বহুমাত্রিক কর্মক্ষেত্র

গত কয়েক দিন নানা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের সঙ্গে কথা বলে দেখলাম এখন সবচেয়ে বেশি চাকরির সুযোগ নামী-দামি কম্পিউটার কোর্স করা ছেলেমেয়েদের। এতই ব্যয়বহুল এইসব কোর্স যে সাধারণ বাঙালী পরিবারের ছেলেমেয়েদের তা নাগালের বাইরে। এঁদের মধ্যে অল্পসংখ্যক যাঁরা কষ্টেসৃষ্টে, ধার দেনা করে এই ধরনের কোনও না কোনও কম্পিউটার কোর্স করছেন তাঁরা একইসঙ্গে ভাগ্যবান ও বাহবা পাবার যোগ্য। তাঁদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

কিন্তু কর্মক্ষেত্র-র লক্ষ্য সার্বজনীন সৌভাগ্য। সেইজন্যই আমাদের পরামর্শ, স্নাতক মানের যোগ্যতাসম্পন্ন সকলেই কম বা মাঝারি খরচের কোনও না কোনও কম্পিউটার কোর্স করুন। যেসব গ্র্যাজুয়েট তরুণ-তরুণী স্টেনোগ্রাফি শিখেছেন বা শিখছেন তাঁরা অবশ্যই ওয়ার্ডস্টার, এম এস অফিস ইত্যাদি কম্পিউটারে চিঠি লেখা ও অফিসের অন্যান্য কাজ চালানোর বিদ্যা শিখে নিন। যাঁরা কমার্স গ্র্যাজুয়েট, বিশেষ

করে সাম্মানিক অনার্স বা এম কম তাঁরা অবশ্যই ফিনানশিয়াল Fax, Tally, Ex ngn ইত্যাদি প্যাকেজগুলি শিখে ফেলুন। আর দুয়েক বছরের মধ্যেই দেখবেন সব অফিসের সব করেসপন্ডেন্স হবে ই-মেলে, আর সব অফিসেই হিসেবপত্তরের কাজ হবে কম্পিউটারে। ফলে করেসপন্ডেন্সের কাজের জন্য ইন্টারনেট অপারেশন ও হিসাবপত্রের কাজের জন্য ফিনানশিয়াল প্যাকেজ অবশ্যই শেখা দরকার। এগুলি কম সময়ে, কম খরচে শেখা যায়। সাধারণ শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের টাইপরাইটিং শেখার ব্যাপক প্রবণতা দেখে বহুকাল আগে আমি লিখেছিলাম ফটো কম্পোজিং শিখতে, সেই সময়ে চাকরির বাজারে ফটো কম্পোজিংয়ের আসন্ন চাহিদার কথা ভেবেই তা লিখেছিলাম। তারপর ১৯৮৭তে হেলসিংকিতে প্রকাশক-সম্পাদকদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গিয়ে জানলাম ফটো কম্পোজিং বিদেশে চার-পাঁচ বছরে আর আমাদের দেশে দশ-পনেরো বছরে বাতিল বা অপ্রচলিত হয়ে যাবে, তার জায়গা নেবে লেসার প্রিন্টিং। হেলসিংকি থেকে ফিরে আমরা এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে উঠে পড়ে লাগি। সমস্যা হল, তখনও ডিটিপি-র উপযুক্ত বাংলা হরফ ছিল না। যেটুকু যা চেষ্টা হচ্ছিল তা পাতে দেবার যোগ্য নয়। বছরখানেকের চেষ্টায় আমরা কলকাতার 'ব্লু স্টার' কোম্পানির কম্পিউটার ডিভিশন ও পুনের কম্পিউটার-টাইপোগ্রাফি সংস্থার সাহায্যে ডিটিপি-র উপযুক্ত বাংলা হরফ তৈরি করিয়ে নিই। সে গল্প এখানে বলবার নয়, এত সংক্ষেপেও বলা যায় না। বিনীতভাবে বলি, তখনও ফটো কম্পোজিং পদ্ধতিতে মুদ্রিত প্রথম বাংলা দৈনিক 'আজকাল' ও ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্র 'আনন্দবাজার' যথাক্রমে ফটো কম্পোজিংয়ের ও সীসার ছাঁচে ঢালা লাইনো টাইপে ছাপা হচ্ছে।

সকলেই জানেন হেলসিংকি সম্মেলনের ভবিষ্যৎবাণী হুবহু ফলে গেছে। সেদিন যেমন যেমন বলা হয়েছিল ঠিক তা-ই হয়েছে। এখন সব সংবাদপত্র ও পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে এই পদ্ধতিতেই ছাপা হয়। এখন যার সর্বজনপরিচিত নাম ডিটিপি বা ডেস্ক টপ পাবলিশিং। ছোট বড় মাঝারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানেই শুধু নয়, ডিটিপি এখন ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছে, উদ্যমী যুবক-যুবতীদের স্বাধীন স্বনির্ভর ব্যবসা হিসাবে।

এই ভবিষ্যতের কথা ভেবেই আমরা ডিটিপি শেখার কথা বলেছিলাম।

আমি কি-আর চাকরি পাব! স্বাধীনভাবে কিছু করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সে কি আমার পক্ষে সম্ভব?

এই রকম সব নেতিবাচক মনোভাব খুবই ক্ষতিকর।

অনেক ছেলেমেয়ে প্রথমেই হেরে যান শুধু এই নেতিবাচক মনোভাবের জন্য। ঠিকমতো বলতে গেলে, তাঁরা যুদ্ধ শুরুই করেন পরাজিত সৈনিক হিসেবে।

জেগে উঠুন এর উল্টো ভাবনায়।

চাকরির জন্য তৈরি হওয়া বা চাকরির দরখাস্ত করাই হোক, কিংবা স্বনির্ভরতার শিক্ষা নেওয়া বা ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করাই হোক— যা কিছু করতে যাবেন, শুরুতেই বিশ্বাস করুন যে সফল হবার সম্পূর্ণ সামর্থ্য আপনার আছে। সামর্থ্য

থাকলেই যে-কোনও কঠিন কাজ করে ফেলা যায় না, সামর্থ্য যে আছে সেই দৃঢ় বিশ্বাসও দরকার। কাজটির যে-কোনও পর্বে যে-কোনও সংকটের সময় এই আত্মবিশ্বাসই আলো দেখায়।

লক্ষ্যে পৌঁছতে যেমন এই প্রবল আত্মবিশ্বাস আর গভীর নিষ্ঠা দরকার, তেমনই দরকার অধৈর্য। অধৈর্যর কথা অনেক আগেই বলেছি। কয়েকদিন আগে বললেন টি সি জি গ্রুপের প্রধান, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের প্রোমোটার পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জি। তাঁর ভাষায়— জয়ী হবার অদম্য ইচ্ছা আর ধৈর্যের অভাব দুটি বড় গুণ। এ দুটির অভাব হলে এই দুনিয়ায় সফল হওয়া যায় না।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র সম্মেলনে বিভিন্ন পত্রিকার কর্ণধারদের সঙ্গে আলোচনা হল পরিষেবামূলক পত্রিকার নতুন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে। নতুন টেকনোলজির সাহায্যে পাঠক পরিষেবা কত দ্রুত ও সরাসরি করে তোলা যায়। নতুন শতাব্দীর নতুন 'কর্মক্ষেত্র' সেভাবেই প্রস্তুত হচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য— আরও উন্নত পাঠক পরিষেবা, আরও দ্রুত ও সরাসরি।

'কর্মক্ষেত্র' প্রথম থেকেই তার পাঠককে দিয়ে আসছে নিত্যনতুন সহায়তা ও পথনির্দেশ। নতুন শতাব্দীতে তা হবে আরও বহুমুখী ও বহুমাত্রিক। এই সংখ্যায় তারই সামান্য সূচনা।

'কর্মক্ষেত্র'-র কোন কোন বিভাগ আপনার বেশি ভালো লাগে? নতুন শতাব্দীর নতুন কর্মক্ষেত্র-য় এছাড়াও আর কী কী আপনি প্রত্যাশা করেন? আমাদের লিখে জানান। নতুন কর্মক্ষেত্র-র বিশদ পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে, এই সময় আমরা সকলের সব রকম প্রয়োজন ও প্রত্যাশার কথা জানতে চাই।

*'কর্মক্ষেত্র', ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০১*

# শুভ কর্মপথের দিশা

সময় কত দ্রুত বদলায় তা সব সময় আমাদের খেয়াল থাকে না। একশো বছর আগে বাঙালীর পরিধান, খাদ্যাভ্যাস, জীবিকা যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনই আছে কি? নেই। আমূল বদলে গেছে। শুধু জীবিকার ক্ষেত্রেই কত না পরিবর্তন! সে-যুগের প্রচলিত অনেক পেশার আজ আর নামই শোনা যায় না। মাত্র কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেও যেসব পেশার প্রচলন ছিল, তার অনেকগুলি এখন উধাও। যেমন ইংরেজি টাইপিস্ট, হিসাবের খাতা লেখক, কাঁসার বাসনের ফেরিওলা, ছাপাখানার কম্পোজিটর, লাইনো-মোনো অপারেটর, ব্লক মেকার— এরকম আরও অনেক।

আবার, এখনকার অনেক উজ্জ্বল পেশার অস্তিত্বই ছিল না সে যুগে। মাত্র কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেও কেউ কি কম্পিউটার প্রোগ্রামার কিংবা সফটওয়্যার বা টিভি সিরিয়াল নির্মাতার কথা জানতেন? কল্পনা করতে পারতেন কম্পিউটারাইজড অ্যাকাউন্টেন্সি বা মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশন বা ওয়েব পেজ ডিজাইনিংয়ের কাজ? এখনকার বহুপরিচিত ডি টি পি অপারেটর পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে কোথাও

ছিলেন কি?

সময় বদলায়। পরিবর্তিত যুগের প্রয়োজন বদলায়। প্রযুক্তি বদলায়। প্রযুক্তির বিকাশও ঘটে প্রচণ্ড গতিতে। ফলে জীবিকাজগতেও আসে বিপুল পরিবর্তন। অনেক প্রচলিত পেশা লুপ্ত হয়ে যায়, অনেক নতুন পেশার জন্ম হয়।

সেইজন্যই স্কুলের পড়া শেষ করে প্রথমেই দরকার সঠিক পেশা বেছে নেওয়া। ছাত্রজীবনের একটা খুব বড় প্রয়োজন পেশা নির্বাচন।

ভবিষ্যৎ পেশা নির্বাচনের সময় একদিকে জানতে হয় পেশার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, অন্যদিকে বুঝতে হয় নিজের প্রবণতা ও মানসিক সামর্থ্য। চাকরির বাজারে খুব চাহিদা, আবার নিজেরও ভারি পছন্দ, এমন পেশা বাছতে পারলে ছাত্রজীবনের সব শ্রম সার্থক। এর উল্টোটা হলে পুরো ছাত্র-জীবনটাই নিষ্ফল হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে ছাত্রজীবনের শেষে কর্মজীবন শুরু করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। খুব দুঃখের সঙ্গেই বলছি, এখনও আমাদের দেশের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী যা হোক কিছু একটা পড়ে তাঁদের মহা মূল্যবান ছাত্রজীবনের বীজগর্ভ বজ্রগর্ভ বছরগুলি বৃথাই কাটিয়ে দেন। বিফলে যায় তাঁদের আত্মপ্রস্তুতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, নিষ্ফল হয়ে যায় নিজেকে গড়ে তোলার সেরা মরসুম।

অনেকেই দেখেছি মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকের পর সামনে যা পান, বা শেষ পর্যন্ত যা পাওয়া যায় তাই নিয়েই অর্থহীন অধ্যয়নে দিন কাটান। ফলে কয়েক বছর পর থেকেই দীর্ঘকাল তাঁদের কর্মহীন যৌবনের বেদনা বয়ে বেড়াতে হয়। অনেক অভিভাবকের মনেই বদ্ধমূল ধারণা— স্নাতক বা স্নাতকোত্তর হওয়াটাই সর্বজনগ্রাহ্য সামাজিক সম্মানের। অতএব কোনওক্রমে বারোর গণ্ডি পেরিয়েই নির্বিচারে বি এ, বি এসসি, বি কম পড়ার ধুম পড়ে যায়। তারপর এম এ, এম এসসি, এম কম। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরাও ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবার বাঁধা রাস্তার বাইরে বড় একটা যেতে চায় না। এই পড়া অর্থহীন, এই পাঠ অর্থ ও সময়ের অপচয়।

গত বাইশ বছর ধরে 'কর্মক্ষেত্র' অসংখ্য পেশার ও পড়াশোনার হদিশ দিয়ে আসছে। প্রচলিত, অপ্রচলিত, পরিবর্তিত, সদ্য-প্রবর্তিত, অভিনব, আকর্ষক —নানা ধরনের পাঠক্রমের সুলুকসন্ধান দিচ্ছে। নতুন যুগের প্রয়োজনে এর ওপর শুরু হয়েছে নতুন বিভাগ 'পেশার দিশা'। কিন্তু কোনও সাপ্তাহিক পত্রিকার পক্ষে দ্রুত পরিবর্তনশীল এই যুগের নিত্যনতুন পেশামালার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করা কি সম্ভব? সপ্তাহে সপ্তাহে, খণ্ড খণ্ড ভাবে? সম্ভব নয়। সেইজন্যই 'কর্মক্ষেত্র' এবার ছাপার অক্ষরের বাইরে এসে আয়োজন করছে 'পেশা মেলা'র। উদ্দেশ্য, পাঠকের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে নতুন যুগের পেশাসমগ্র মেলে ধরা। এক সঙ্গে, এক ছাদের নীচে নানা পেশার মেলা, বিভিন্ন পাঠক্রমের প্রদর্শনী। এই মেলা যুবসমাজকে দেবে যুগোপযোগী পেশার দিশা।

যাঁরা মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ, বা যাঁরা এবছরই এই দুটি পরীক্ষা দিয়েছেন, মেলায় তাঁদের জন্য যেমন নানান নামী দামি প্রশিক্ষণ বা পাঠক্রমের তথ্য-পরামর্শ মিলবে, তেমনই যাঁরা স্কুলের পর পড়াশোনার আর সুযোগ পাননি বা যাঁরা স্কুলের গণ্ডিও পেরতে পারেননি তাঁদের জন্যও থাকছে নানান কাজ ও প্রশিক্ষণের

পথপ্রদর্শন। যাঁরা নিজেরাই স্বাধীনভাবে কিছু করতে চান, গড়তে চান নিজস্ব কোনও ছোটখাটো ব্যবসা, তাঁরা পাবেন একসঙ্গে একনজরে অন্যরকম ব্যবসার রূপরেখা।

সকলের জন্যই মিলবে কোনও না কোনও পথ। নানা পেশার নানা পথের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠবে এই পেশা মেলা— 'কর্মক্ষেত্র' কেরিয়ার অ্যান্ড কাউন্সেলিং ফেয়ার ২০০২। আমাদের আশা, এ মেলা সর্বজনের কর্মজীবনের প্রবেশপথে আলো দেখাবে, তরুণ সমাজকে এগিয়ে দেবে শুভ কর্মপথে।

*কর্মক্ষেত্র, ৫ মে ২০০২*